সুবোধ ঘোষের নির্বাচিত গল্প

পাঠ প্রতিক্রিয়া

সম্পাদনা

অধ্যাপক অনিমেষ গোলদার

সুবোধ ঘোষ

১৪.৯.১৯০৯-১০.৩.১৯৮০

Subodh Ghosher Nirbachita Golpa : Path Pratikriya

Edited by : *Prof. Animesh Golder*

Published by
Diya Publication, 44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com || diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/
প্রকাশনা ও বিপণন সংক্রান্ত কথা : কৌস্তভ বিশ্বাস

ISBN : 978-93-92110-82-5

প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৪২৯

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৩০০

'ফসিল' : মহাকাব্যিক অণুবিশ্ব

প্রত্যুষ কুমার জানা

'মহৎ কবিতা শতবার ঘুরি বিচ্ছুরিত করি দেয় শত আলোকের ছুরি'—শুধু মহৎ কবিতা কেন, যে-কোনো মহৎ সৃষ্টি বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখে। সুবোধ ঘোষ লিখিত দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল'-এর সে উপাদান আছে। সাম্যবাদী সমাজবিজ্ঞানের যে বলিষ্ঠ ভরসা সাহিত্যে প্রচারকার্য চালিয়ে এসেছিল, 'ফসিল'-এ এসেই তা প্রথম শিল্প সার্থক রূপ লাভ করল। এখানেই প্রথম দেখা গেল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের দুঃখ-চেতনা। এ গল্পে সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্র-মধ্যবিত্ত এবং শোষিত-কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম অধিকার সঞ্জাত প্রতিবাদীকণ্ঠ ও পরিণামী বিনষ্টি থেকে সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের পাঠ নেওয়া সম্ভব। 'ফসিল' গল্পে যে এত বিচিত্র, গভীর বিষয় জায়গা পেয়েছে তা কি ছোটোগল্পের তাত্ত্বিক সংরূপকে অক্ষুণ্ণ রেখেই? আমরা 'ফসিল' গল্পের আলোচনার শিরোনাম করেছি—'ফসিল : মহাকাব্যিক অণুবিশ্ব'। সংগত কারণেই আমাদের আলোচনার অভিমুখে দুটি বিষয় থাকবে—'ফসিল' গল্পের মহাকাব্যিক বিস্তার এবং 'ফসিল'-এ ছোটোগল্পের তাত্ত্বিক সংরূপ কতখানি রক্ষিত হয়েছে 'ফসিল' গল্পের বিষয় গুরুগম্ভীর। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ যুগ এবং ধনতন্ত্রের আত্ম-প্রতিষ্ঠার দ্বান্দ্বিকতার পটভূমিতে গল্পটি বিন্যস্ত। 'ফসিল' গল্পের প্রথম বাক্যেই তার প্রতিফলন—"নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-আটষট্টি বর্গ-মাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই।"[১] সাড়ে আটষট্টি বর্গ মাইলের অধিকারী ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-প্রভুর প্রতাপ বংশানুক্রমিক। তাই বাঘের বাচ্চা বাঘই—"দু-পুরুষ আগে এরাজ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শুলে চড়ানো হত; এখন সেটা আর সম্ভব নয়। তার বদলে শুধু ন্যাংটো করে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।"[২]

সামন্ততন্ত্রে সামন্তপ্রভু আধুনিক মানুষ, মসৃণ শোষণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীকে অনায়াসে শূলে চড়িয়ে দিতেন কেননা তিনি ধর্মপাল। ধর্ম রক্ষার ন্যায়দণ্ড তাঁর হাতে। অপরাধীর বিচার করার জন্য 'ন্যায়াধীশ' আছেন, আছে 'বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথা'। মৃত্যু বা হত্যার দায় সামন্তপ্রভুর নয়। পূর্বপুরুষের মতো বিলীয়মান সামন্তপ্রভু শোষণ-প্রতিবন্ধক প্রজাকে হত্যার দায় থেকে নিজেকে সমদূরত্বেই রাখেন—'ন্যাংটো করে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া-র' মধ্যেই তার প্রতিফলন। শুধু তা-ই নয় এদেশে বেণিয়াদের আবির্ভাবের পূর্বে যে দু-জাতের আমলা

সহযোগে সামন্ত-প্রভু শোষণ-যন্ত্রকে সচল রাখতেন অঞ্জনগড়ের নরপাল সেই ক্ষত্রিয় ও মোঘল দুই জাতকেই রেখেছেন শোষণ-যন্ত্রকে নিশ্ছিদ্র রাখতে। কিন্তু বেণিয়াদের আবির্ভাব সেই নিশ্ছিদ্র শোষণেও ছিদ্র আনে—"সেই অপূর্ব অদ্ভুত শাসনের ঝাঁজে রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দুর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।" শোষিত বিকল্পের সন্ধান পেয়েছে, আর এক নতুন প্রভুর আবির্ভাবে। আর এই বিকল্পের সন্ধান-ই কুর্মী ও ভীল প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলে। দু-ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে এনে জমিতে সেচ দিয়ে ভীল ও কুর্মী প্রজারা যে ভুট্টা, যব আর জনার ফলায় সে ফসল তারা কিছুতেই ছাড়তে চায় না। রাজায়-প্রজায় সংঘর্ষ বাধে। মাত্র এক ঘণ্টায় মহারাজা অনায়াসে বিদ্রোহ স্থিমিত করে দেন বটে কিন্তু তারা কেউ চলে যায় নয়াদিল্লি, কেউ কলকাতা, কেউ শিলং। শোষিত-ই যদি না থাকে মহারাজা শোষণ করবেন কাকে অগত্যা মহারাজা শাসন প্রণালী পরিচালনায় ইংরেজি আইননবীশ মি. মুখার্জিকে নিয়োগ করেন। তাঁর ভাবনায় আদর্শবাদ আর মার্কিন ডেমোক্রেসি। যে সৎসাহসী সে কখনো পরাজিত হতে পারে না, যে কল্যাণকৃত তাঁর কখনো দুর্গতি হতে পারে না—এই বিশ্বাসে সে স্টেটের উন্নতি সাধনায় ব্রতী হয়। ডেমোক্রেসির ভাবনা থেকেই তিনি লাঠিবাজি বন্ধ করে দেন। সে অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ আবিষ্কার করে কলকাতার মার্চেন্টদের ডেকে এনে লক্ষ লক্ষ টাকায় কাঁকরে মাটির ডাঙাগুলি নিরানব্বই বছরের ইজারা দিলে অঞ্জনগড়ের শ্রী ফিরে যায়। অঞ্জনগড়ে গড়ে উঠতে থাকে আধুনিক নগর সভ্যতা।

কল্যাণকামী মি. মুখার্জি ইরিগেশন স্কিম, একটা ব্যাংক, একটা ট্যানারী, একটা কাগজের মিল, আর একটা স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ভাবে। মহারাজা স্কুল প্রতিষ্ঠায় তীব্র আপত্তি জানায়-কভি নেহি। স্কুল প্রতিষ্ঠা হলে প্রজারা শিক্ষিত হলে মসৃন শোষণ যে চলে না ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রভুর তা জানা। তার বদলে মহারাজ চান আভিজাত্যের পসরা—দুটো পোলো গ্রাউন্ড, প্যালেসের বিস্তৃত বাগানে মাইনে করা একজন ইটালিয়ান ব্যান্ড মাস্টার।

কিন্তু সমস্যা হল এক শোষিতের দুই শোষক। মি. মুখার্জির ইরিগেশন স্কিম বাস্তবায়িত হলে প্রজারা কৃষি কাজে যুক্ত হলে মহারাজার অর্থভাণ্ডার পূর্ণ হবে কিন্তু ধনতান্ত্রিক প্রভুদের খনিতে শ্রমিকের অভাবে ক্রমবর্ধমান ব্যবসা লোকসানের মুখে পড়বে। সংগতকারণে সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসন দুলাল মাহাতোকে তোয়াজ করতে থাকে। মহারাজার কাছে তাদের দাবির আবেদনপত্র লিখে দেয়, মহারাজার বিরুদ্ধে কুর্মীদের আবেদন দিল্লির ডাকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। কুর্মী কৃষকদের খনির কাজে টেনে আনতে দুলাল মাহাতোর আবেদনে সাড়া দিয়ে সিন্ডিকেট 'কুলিদের মজুরীর রেট, হপ্তা পেমেন্ট, ছুটি, ভাত আর ওষুধের' সঙ্গে কয়লা আর কেরোসিন তেলের ব্যবস্থা পাকা করেছে। গিবসন কুর্মীদের অভয় দেন যদি মহারাজা তাড়িয়ে দেন তবে সিন্ডিকেট কুর্মীদের জন্য বিশ ডজন ধাওড়া করে দেবে।

ধনতান্ত্রিক প্রভুদের পরামর্শে ও দুলালের অর্জিত অভিজ্ঞতায় ও নেতৃত্বে কুর্মীরা নিজেদের অধিকার আদায়ে মহারাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতের পথে এগিয়েছে—

১. কুর্মীরা রাজবাড়ীর বাগানে আর পোলো লনে বেগার খাটতে এল না। তারা বলছে-বিনা মজুরীতে খাটলে পাপ হবে; রাজ্যের অমঙ্গল হবে।[৩]

উপরন্তু তারা মহারাজকে জানিয়ে দিয়েছে—

২. এ বছর ভুট্টা, যব, জনার যা ফলবে, তাতে যেন সরকারি হাত না পড়ে। আইনসঙ্গতভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ নেব।[৪]

৩. যেহেতু আমরা নগদ মজুরি পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেইহেতু আমরা খনির কাজ ছাড়তে অসমর্থ। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না।[৫]

৪. আগামী মাসে আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ-তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়।[৬]

৫. আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।[৭]

কুর্মী প্রজাদের প্রাপ্য দাবি, অধিকারবোধ, প্রজাকল্যাণে মহারাজার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা, সংঘবদ্ধভাবে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধে সামিল হওয়ার জন্য কুর্মীদের মণ্ডল প্রতিষ্ঠা—'আর ভয় করলে চলবে না, পেট আর ইজ্জত-এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোন মতেই ক্ষমা নয়।[৮] এ যে ধনতন্ত্রের উস্কানির ফসল সন্দেহ নেই—তা হতে পারে খনি শ্রমিক দুলাল মাহাতোর সারা জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতার ফসল, তা হতে পারে ধনতান্ত্রিক প্রভুদের 'শোষিত' অধিকার করার কৌশল। সিন্ডিকেট নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে কুর্মীদেরকে মহারাজার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। এটা মিস্টার মুখার্জির ইরিগেশন স্কিমকে ব্যর্থ করার প্রচ্ছন্ন কৌশলও। শ্রমিকদের স্থূল-পার্থিব ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের মন জিতে নিয়ে তাদের জীবিকার বিকল্পকে ধ্বংস করে দিতে পারলেই তারা ধনতন্ত্রের মুখব্যাদানে ঢুকতে বাধ্য হবে। অন্যদিকে কুর্মীরা দেখেছে মহারাজার জমিতে চাষ করে ফসলের কণামাত্র না পাওয়ার থেকে সিন্ডিকেটের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। এজন্য—'কুর্মী কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরী পায়, মুর্গি বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদক, ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।'[৯]

গল্পে 'শোষিত'-কে অধিকার করার লক্ষ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছিল কিন্তু সামন্তপ্রভুর সঙ্গে সিন্ডিকেটের প্রত্যক্ষ সংঘাত বাধে—তখন-ই, যখন মহারাজার পেয়াদা এসে খনির ভিতরে ঢুকে অবাধ্য চারজন কুর্মী কুলিকে ধরে নিয়ে যায় ও তাদের স্ত্রীদের মারধর করে। তখন সিন্ডিকেট এ ঘটনাকে মহারাজার অধিকারবিরুদ্ধ মনে করে এর তীব্র প্রতিবাদ করে—

> মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভেতর ঢুকে চারিজন কুর্মী কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীদের লাঠি দিয়ে মেরেছে। আমরা একে অধিকার বিরুদ্ধ মনে করি এবং দাবী করি মহারাজার পক্ষ থেকে শীঘ্র-ই এ ব্যাপারের সুমীমাংসা হবে।[১০]

সামন্ত প্রভু অঞ্জন গড়ের মহারাজার ভাবনায় সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইলে অন্যান্য সম্পত্তির মতো কুর্মী প্রজারাও তার সম্পত্তি। এখানে তিনিই শেষকথা বলবেন। কিন্তু সময় যে পালটেছে ফিউডলী দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জত কমপ্লেক্সে জর্জর মহারাজা তা বোঝেননি, বা বুঝতে চাননি। সংগতকারণে সিন্ডিকেটকে মহারাজা নোটিশ দিয়েছিলেন—'যেন আমার বিনা সুপারিশে কোন কুর্মী প্রজাকে কুলির কাজে ভর্তি না করে। সিন্ডিকেট পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষের আগে তারা নতুন কোনো চুক্তি মহারাজার সঙ্গে করবেন না।

সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের এই প্রত্যক্ষ সংঘাতে মি. মুখার্জি সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করলেও তা ব্যর্থ হয়েছে। সামন্তপ্রভু চাইছেন তাঁর একাধিপত্য বজায় থাকুক আর ধনতান্ত্রিক প্রভু চাইছেন তাদের একাধিপত্য গড়ে উঠুক। আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মূলত শ্রমজীবী মানুষের উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। মধ্যবিত্ত, চাকুরিজীবী মি. মুখার্জি সবসময় চেয়েছেন অঞ্জনগড়ে কৃষি ও শিল্পের সহাবস্থান।

কুর্মী কৃষক দুলাল মাহাতো একসময় অঞ্জনগড় থেকে পালিয়ে ছিল মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে সামন্তপ্রভুর অমানবিক শোষণ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায়। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জিত হওয়ার আগে সে বোঝেনি যে, সে এক শোষকের খপ্পর থেকে রেহাই পেতে ধরা দিয়েছে আরও ধুরন্ধর, আরও কূটকৌশলী আর এক শোষকের জালে—"বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মরিশাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা, বুক ভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে।"[১১] সে তার জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু বুঝেছে শোষক জাতের ইতর বিশেষ নেই। অঞ্জনগড়ে সামন্ত প্রভুর কথা না শুনলে 'শুলে চড়তে' বা অজস্র মৌমাছির দংশনের অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু, সব মেনে নিলে অনাহারে মৃত্যু, আর মরিসাসে আপাত মোলায়েম আচরণের নেপথ্যে যে শোষণ থাকে তাতে কুলিরা বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতাটুকুও হারায়। বাকি জীবনের সম্বল 'সাতটি টাকা' দিয়ে তারা বিদেয় করে।

সামন্ততন্ত্রের শোষণে, ধনতন্ত্রের শোষণে নিষ্পেষিত দুলালের কাছে এদের প্রতি বিশ্বাস আর আশ্বাসের কোনো মূল্য নেই—"ভাইসব, এই বুড়োর মাথায় য'টা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। একহাতে নেবে অন্যহাতে সেলাম করবে।"[১২]

দুলালের এই অভিজ্ঞতা যে শোষকের দ্বিচারিতা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধি করার কৌশলের পরিণাম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসন ও ম্যাককেনা-র কথোপকথনে তা স্পষ্ট। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সামনে মাহাতোকে তোয়াজ করে আর ভিতরে ভিতরে তাকে পোষা বেড়াল ভাবে। গিবসন তাকে দিয়েই কৃষির বিনাশ সাধন করতে চায়। যেমন করে মানব কল্যাণের মিশনকে সামনে রেখে লেবার হস্তগত করতে চায়। "মিস্টার মুখার্জী, আমরা মানিমেকার নই, আমাদের একটা মিশনও আছে। নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে আরো লড়বো।"[১৩] এদের চরিত্রের স্বরূপ দুলালের জানা। তাই দাবি আদায় না করে দুলাল আবেগে ভাসে না। ওরা যেমন ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে তেমনি দুলালও ছলে-বলে-কৌশলে কুর্মী কুলিদের ন্যায্য আদায় করে তবেই পরের কথা বলে। সে মহারাজের সামনে, 'মেষ শিশুর মত ভীরু-দুলাল যেন ঠক,ঠক, করে কাঁপছে,' মিস্টার মুখার্জির সামনে তেমনি বিনয়াবনত কিন্তু নিজেদের দাবি থেকে একবিন্দু সরে আসেনি—"মুখার্জীর পায়ে হাত রেখে দুলাল বলল-কসম, এজেন্ট বাবা, তোমার কথা রাখব। বাপের তুল্য মহারাজ, তাঁর জন্য আমরা প্রাণ দিতে তৈরী। তবে ঐ দরখাস্তটি যদি একটু জলদি মঞ্জুর হয়।"[১৪] শোষিত হতে হতে দুলালও কূটকৌশলী হয়ে উঠেছে। দাবি আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে কুর্মীদের সংঘবদ্ধ করে

ভবিষ্যতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে—কেননা এদের উপরে তার বিশ্বাস নেই। তাই সিন্ডিকেটের রাতারাতি বিশ ডজন ধাওড়া তৈরি করে কুর্মিদের ভর্তি করে নেওয়ার প্রস্তাবে দুলালের জবাব—"আচ্ছা, সে হবে। তবে আপাতত কুলি পিছু কিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফতি দেবার অর্ডার হোক।"[১৫]

এ গল্পে সংগ্রাম আছে—আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। আছে হত্যা, আত্মহত্যা। শোষক সামন্ততন্ত্র নিজের আধিপত্য-একাধিপত্য বজায় রাখতে চাইছে আর নবোদ্ভূত বণিকতন্ত্র আধিপত্য-একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এই দুই শ্রেণির লক্ষ্য শোষণ-যন্ত্রের প্রধান উপাদান শ্রমজীবী মানুষ। আর শ্রমজীবী কুর্মীরাও নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে সংঘবদ্ধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। দুই শোষক—কেউই শ্রমজীবীর কল্যাণ সাধনে আন্তরিক নয়। মহারাজার প্রতিনিধি হয়ে মি. মুর্খাজি যখন দুলাল মাহাতোর বাড়ি গিয়ে তাকে বলেছে—

> একি কোরছো মাহাতো। দরবারের ছেলে তোমরা; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো করে বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জত নষ্ট করে না। সিন্ডিকেট আজ না হয় তোমাদের ভালো খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরাবে তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে।[১৬]

মি. মুখার্জির বক্তব্যে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মৌল পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। এ গল্পে সামন্ততন্ত্রে অমানবিক শোষণের কথা আছে কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর কথা নেই। ধনতন্ত্রের শোষণের জাজ্বল্য প্রতিফলন তো দুলাল মাহাতো—বাকি জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে।' সাত টাকায় দুলালের কতদিন চলবে? তারপর? ধনতন্ত্র তার শোষিতের ভিতর থেকে রস নিংড়ে ছিবড়ে করে দেয়—দুলালের বুকভরা হাঁপানি তা-ই প্রমাণ করে। ধনতন্ত্র শ্রমিকের যোগ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করে না। করলে চোদ্দো নম্বর পীঠ-এ 'নব্বইজন পুরুষ আর মেয়ে কুলি চাপা' পড়ে মরত না। এ ঘটনা ঘটার কারণ—'তৃতীয় সীমের ছাদটা ভালো করে টিম্বার করা ছিল না, তাতেই এই দুর্ঘটনা। নব্বইজন পুরুষ তো চাপা পড়েছে কিন্তু মেয়ে কুলির সংখ্যা কত হিসেব নেই। 'রক্তকবরী' নাটকে খনি শ্রমিকেরা নামে না হোক অন্তত সংখ্যা চিহ্নিত ছিল। এখানে তাও নেই। এতগুলো মানুষের অসহায় মৃত্যুর আর্তনাদে সিন্ডিকেটের কোনো ব্যক্তির বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। বরং তারা এর তথ্য লোপাট করে এই ঘটনার সমস্ত চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে। অন্যান্য ধাওয়া থেকে দৌড়ে আসা কুলিদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে কেউ মরেনি, কেউ ঘায়েল হয়নি। তোমরা কাজে যাও কিছু হয়নি। সিন্ডিকেটের একমাত্র চিন্তা—

> ম্যাককেনা বলল—দি মহারাজার কানে পৌঁছে গেছে সব। তাছাড়া, দ্যাট মাহাতো; তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? কালকের সকালেই শহরের কাগজগুলো খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তারপর আসবেন একটি এনকোয়ারী কমিটি; গান্ধিয়াইট বদমাসও বোধ হয় তার মধ্যে থাকবে। বোঝ ব্যাপার।[১৭]

আর মহারাজার প্রতিক্রিয়া তার রাজ্যের ধুলো মাটি বেচে যারা পেট চালায় সেই ফিরিঙ্গি বেণিয়াদের জব্দ করতে চাইছিলেন যেনতেন উপায়ে। প্রজার মৃত্যুর এই খবরে 'প্রজার বাপ' মহারাজা কিন্তু শোকগ্রস্ত নয়, তিনি উল্লাসিত। এতগুলো প্রজার মৃত্যু তার মনে বিন্দুমাত্র

বেদনার জন্ম দেয় না, জন্ম দেয় উল্লাসের। পেয়াদার দেওয়া এ সংবাদ তাঁর কাছে সুসংবাদ—"অতি সুসংবাদ! মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন। এইবার দুসমন মুঠোর মধ্যে, নির্দয়ের মতো পিষে ফেলতে হবে এইবার।"[১৮] কিন্তু ঘোড়ানিমের জঙ্গলে ফৌজদারের হাতে বাইশজনের মৃত্যু আর পঞ্চাশের ওপর ঘায়েলের ঘটনায় মহারাজার অনুশোচনা নেই, নেই শোকও। আছে কোণঠাসা হয়ে গদিচ্যুত হওয়ার ভয়—এই ভয় সিন্ডিকেটকে। মাহাতো যে ভয়ের কারণ হতে পারে তা মহারাজার অগোচরে ছিল। মুর্খাজি মাহাতোকে আটক করতে বলেছিল কিন্তু রাজার পঞ্চাশজন পেয়াদা মাহাতোর শবদেহ এনেছে। আর বিবদমান দুই শোষক—মহারাজা এবং সিন্ডিকেট শোষক স্বার্থে হাত মিলিয়েছে। ঘোড়ানিমের জঙ্গলের শবদেহের সঙ্গে মাহাতোর শবদেহ এনে—'ক্ষুধার্থ পীঠটার মুখে মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিলে একে একে।'[১৯]

মানব সভ্যতার বিস্তৃত কালের পটভূমিতে গল্পটি বিন্যস্ত। 'ফসিল' নামকরণে সুদূর অতীতের অনুষঙ্গ, আবার গল্পে টানটান টেনশন ও একটার পর একটা ক্রিয়ার ধাক্কায় অতীতের আবেশ কেটে যায়। পাঠক বাস্তবতার পটভূমিতে চলে আসেন। গল্প শেষ হয় শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখার্জির 'অনেকদিন পরের একটা কথা'-র উপলব্ধিতে। এগল্পে মহাকাব্যের আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনির মতো অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতে ভাবনার বিস্তার। আকৃতিগত বিশালতার কারণে এ যুগের কোনো শিল্পকর্মকে মহাকাব্যিক আখ্যা দেওয়া হয়নি, বিষয়ের গভীরতার কারণে তা মহাকাব্যিক অভিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এদিক থেকে ফসিল ছোটোগল্পটিতে বিষয়ের গভীরতা আছে। সামন্ত-তন্ত্রের স্বর্ণযুগের শাসন-শোষণ—ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-তন্ত্রের প্রতিভূর ফিউডলী দেমাক, আর ইজ্জত কমপ্লেক্সে জর্জর মহারাজার রাজকীয় চালচলন ও শাসন-শোষণে সামন্ততন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা আর অন্যদিকে নব-উদ্ভূত ধণতন্ত্র আত্ম-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেপরোয়া। মুখার্জির মধ্যবিত্ত মানসিকতা, কূর্মী প্রজাদের/শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংঘবদ্ধ লড়াই ও শোষকের সংঘবদ্ধ কূটকৌশলের কাছে তার সমূল বিনষ্টি গল্পে বিষয়ের গভীরতাকে প্রকাশ করে।

সামন্তপ্রভু প্রজার আচরণে ক্ষুব্ধ হলে অর্থাৎ পোলো লনে বেগার খাটতে না চাইলে, তাদের উৎপাদিত ফসলের যতটুকু রাজার প্রাপ্য ঠিক ততটুকু দিয়ে দেয় করের প্রমাণ স্বরূপ রসিদ চাইলে, স্বাধীনভাবে জীবিকা গ্রহণের অধিকার প্রকাশ করলে, বিনা টিকিটে জঙ্গল থেকে লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি চাইলে, রাজা যেহেতু প্রজাপালক সেই ভাবনাকে সামনে রেখে কৌশলে তারা তাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য অনুদান চাইলে তা মহারাজার কাছে প্রজার স্পর্ধা বলে বিবেচিত হয়। তখন মহারাজার ফিউডালী ইজ্জতে আঘাত লাগে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রজার মুণ্ডচ্ছেদ করতে চান—"মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি, দুদিন দুরাত দেখি।"[২০] কিংবা মহারাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভ্র খনিতে কাজ করতে যাওয়া মহিলা কুর্মীদের মারধর করা, মুঙ্গেরী বন্দুক চালিয়ে বাইশজন কুর্মীকে প্রাণে মেরে ফেলা ও পঞ্চাশের ওপর ঘায়েল করার ঘটনা উরুভঙ্গ বা বুকচিরে রক্তপানের কথা স্মরণ করায়। বীরযুগে অকৃত্রিমতা ছিল, সত্যধর্ম ছিল, প্রজা পালনের

পেশা ছিল। অঞ্জন গড়ের মহারাজার কিন্তু এসব গুণ নেই। তার ধর্মের ভয় নেই, সিন্ডিকেটের ভয় আছে, পলিটিক্যাল এজেন্টের ভয় আছে।

ছোটোগল্পের তাত্ত্বিক সংরূপে আছে—ছোটোগল্প হবে একমুখীন। প্রজারা বা শ্রমিকরা পরিবেশগতভাবেই বলিপ্রদত্ত হয়—এই একমুখিনতাই 'ফসিল' গল্পের লক্ষ্য। সামন্ততন্ত্রে প্রজারা শূলে চড়ে, মৌমাছির দংশনে, কিংবা মুঙ্গেরী গাদা আর দেড় ছটাকী বুলেটে মৃত্যু বরণ করে, আর ধনতন্ত্রে খনিগর্ভে চাপা পড়ে। সময়ের বিবর্তন হয়, সভ্যতার বিকাশ হয়, শাসক-শোষকের পরিবর্তন হয় কিন্তু অমোঘ নিয়মে শ্রমজীবী মানুষ বলি প্রদত্ত- এর পরিবর্তন বা বিবর্তন নেই। এই একক প্রতীতিকে প্রকাশ করেও 'ফসিল' সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের স্বরূপ, এবং পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ের যে চকিত আভাস দেয়, তা থেকে উপরোক্ত বিষয়গুলির পাঠ নেওয়া সম্ভব। ছোটোগল্প বলেই এই চকিত আভাস। প্রতীতিমুখ্য গল্প হয়েও ফসিল-এর এই মহাকাব্যিক বিস্তার চোখে পড়ার মতো।

'The philosophy of Short story' গ্রন্থে Brander Mathews ছোটোগল্পে—'Unity of impression' এর কথা বলেছিলেন। এই 'Unity of impression' কে প্রকাশ করার জন্য গল্পকার অবলম্বন করেন—'single character, event and emotion'। ছোটোগল্পে গল্পকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দু-একটি চরিত্র নির্মাণ করে প্রতীতিকে ব্যক্ত করেন। মনে হতে পারে 'ফসিল' গল্পে চরিত্র সংখ্যা অনেক কিন্তু সচেতনভাবে দেখলে দেখা যাবে, ফসিল-এর চরিত্র সংখ্যা তিন বা চার-মহারাজা, সিন্ডিকেট, কুর্মীপ্রজা/ শ্রমিক, পলিটিক্যাল এজেন্ট, ল-এজেন্ট মুখার্জী। এরা শ্রেণিচরিত্র। এই শ্রেণি ইংরেজি 'type' চরিত্র অর্থে নয়। সামন্ততন্ত্র (মহারাজা ও সামন্ততন্ত্র সচল রাখার সহযোগীগণ), ধনতন্ত্র (গিবসন, ম্যাককেনা প্রমুখ), শ্রমজীবী (কুর্মী প্রজাগণ), মধ্যবিত্ত (পলিটিক্যাল এজেন্ট, ল-এজেন্ট)। অন্যদিকে শোষক (সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র), শোষিত (কুর্মি প্রজা, শ্রমিক) মধ্যবিত্ত (পলিটক্যাল এজেন্ট, ল-এজেন্ট) এই দিক থেকে চরিত্র সংখ্যা তিন। এই কারণেই বলেছিলাম 'ফসিল' গল্পের চরিত্র সংখ্যা তিন বা চার। 'ফসিল' গল্পের চরিত্র-চিত্রণের আলোচনায় ড. ইন্দ্রাণি চক্রবর্তী বলেছিলেন-

> এই গল্পে প্রধান চরিত্র তিনটি—মহারাজা, মুখার্জি ও দুলাল মাহাতো। ধনতান্ত্রিক প্রভুদের একটা গোষ্ঠী হিসাবে দেখানো হয়েছে, যে গোষ্ঠীর প্রতিনিধি- গিবসন ও ম্যাককেনা। গিবসন ও ম্যাককেনা গোষ্ঠী-প্রতিনিধি বলেই এদের চরিত্রের মানবিক দিকটি দেখানো হয়নি। সচিবোত্তম, ফৌজদার এসেছেন পার্শ্বচরিত্র হিসেবে; কয়েকটি আঁচড়ে এঁরা স্পষ্ট এবং কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। আর রয়েছে ভীল কুর্মির দল-অনেকটা জনতা চরিত্র বা Mob-C হিসেবে।[২১]

আসলে 'ফসিল' গল্পে সমস্ত চরিত্র গোষ্ঠীচরিত্র। চরিত্রের মানবিক দিক থাকা বা না-থাকাটাও চরিত্র-গোষ্ঠীর পরিচায়ক। গল্পে যাদের মানবিক দিক দেখানো হয়েছে তারা হয় সামন্ততন্ত্রের, নয়তো মধ্যবিত্ত, নয়তো প্রজা। আর যাইহোক ধনতন্ত্রের নয়। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের মৌল পার্থক্য এখানেই। মুর্খাজির বক্তব্যেও এই পার্থক্য স্পষ্ট—

> একি করছো মাহাতো। দরবারের ছেলে তোমরা; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জৎ নষ্ট করে না। সিন্ডিকেট আজ না হয় তোমাদের

ভাল খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে।[২২]

আর ধনতন্ত্রের জাজ্বল্য ফলশ্রুতি তো দুলাল মাহাতো নিজেই। চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে 'ফসিল' কি ছোটোগল্প সংরূপের তাত্ত্বিকভিত্তিকে অতিক্রম করেছে উপন্যাসের মতো ছোটোগল্পে চরিত্রের বিবর্তন নেই। ল-এজেন্ট ও সিন্ডিকেটের আগমনে অঞ্জনগড়ে নতুন প্রাণের জোয়ার, দুলালের আবির্ভাবে কুর্মী প্রজাদের জীবনে চঞ্চলতা ও নতুন অধ্যায়ের সূচনা, ঘোড়ানিমের জঙ্গলে মণ্ডল প্রতিষ্ঠা, ভীল-কুর্মী প্রজাদের কৃষিজীবী থেকে শ্রমজীবীতে বিবর্তন, প্রজার উন্নয়নে মহারাজার কোশাগার থেকে নগদ অর্থ দাবি করা, মহারাজার চোখে জল, মুখার্জির স্বপ্নভঙ্গ ও স্টেটের কাজকর্ম বাদ দিয়ে পোলো লনে ঘোড়া ছোটানো—ইত্যাদি চরিত্রের শ্রেণি স্বরূপকে যেমন ব্যক্ত করে, তেমনি মাত্রাগতভাবে চরিত্রের বিবর্তনকে তুলে ধরে। চরিত্রের এই বিশিষ্টতাকে বলতে চাইছি—ছোটোগল্প সংরূপকে অবলম্বন করেই অতিক্রমণ। 'ফসিল' গল্পকে মহাকাব্যিক বলার এটা অন্যতম একটা কারণও।

বৃত্ত গঠনের ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যের এই সংরূপে কাহিনির জটিলতা অপেক্ষা উপস্থাপনার সমস্যাই প্রধান তাই উপন্যাসের মতো কাহিনি-উপকাহিনি বিন্যাসে সরল-জটিল-যৌগিক বিন্যাস নির্মিতি এখানে নেই। আবার একটি প্রতীতি যেহেতু ছোটোগল্পকারের প্রধান অবলম্বন সেই কারনে প্রতীতির প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁকে বৃত্ত গঠন করতে হয়। 'ফসিল' গল্পে আছে সোপানারোহ (Stair-Step Construction) বৃত্ত গঠন। এই গল্পে ঘটনাগুলি ক্রমশ একটি তুঙ্গ অবস্থা বা crisis-এ পৌঁছেছে, তারপর-ই দ্রুত সমাপ্তি ঘনিয়ে এসেছে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রে সিন্ডিকেটের আগমনে নতুন প্রাণের জোয়ার-প্রজাদের বেগার খাটতে অস্বীকার-মহারাজার কাছে প্রজাদের দাবি আদায়ে কুর্মীদের সঙ্ঘাবদ্ধ অবস্থান-খনিতে প্রজাদের যোগদান-মহারাজা ও সিন্ডিকেট বিরোধ-চোদ্দো নম্বর পীঠ ধ্বসে কুর্মী শ্রমিকের মৃত্যু-মহারাজার ফৌজদারের হাতে কুর্মী প্রজার মৃত্যু—দুই বিরোধী শক্তি মহারাজা ও সিন্ডিকেটের পরস্পরের করমর্দন—মুর্খাজির উপলব্ধির প্রকাশে গল্পের সমাপ্তি।

প্রথম পুরুষে বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত এ গল্পে বস্তুধর্মী সাহিত্য লেখকের বিবৃতির মধ্যে নির্মম নিরাসক্তি আছে। এই রীতিকে Dramatic বা নাটকীয় রীতি হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। 'ফসিল' গল্পটির সূচনা বর্ণনাশ্রয়ী। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত চাঁছা-ছোলা ভাষায় এক একটি বিষয়কে ডিটেলসহ একসঙ্গে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। শক্ত বাঁধুনির ছোটো ছোটো বাক্য। ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ভাষা আর বিদ্রুপাত্মক বিবৃতি বিষয়ের গুরুভার আর জটিলতা থেকে গল্পকে রক্ষা করেছে। তীব্র গতি সম্পন্ন ভাষার সঙ্গে ইঙ্গিতময়তায় বা Suggestiveness ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়েছে। ফলে সমগ্র গল্পটি দৃঢ়পিনদ্ধতা লাভ করেছে—বাড়তি একটিও শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ না করায় গল্পকারের সংযম পূর্ণাঙ্গরূপে রক্ষিত হয়ে ম্যাথুজ কথিত—If his very initial Sentence tend not to the outbringing of this effect, then he has failed in his first step'-কেও গল্পকার সচেতনভাবে রক্ষা করেছেন।

মহাকাব্যে দেশ বা জাতির জাতীয় জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় থাকে। 'ফসিল' গল্পে ভীল ও কুর্মীদের ইতিহাস আছে। সাতপুরুষ ধরে বসবাস করে আসা কুর্মীদের

লালন-ক্ষেত্র ঘোড়ানিমের জঙ্গল সামন্ত-প্রভুর হস্তগত হয়েছে। ঘোড়ানিম, ফণিমনসায় ছাওয়া রুক্ষ কাঁকড়ে মাটির ভাঙা নেড়া পাহাড়, সালসার মতো সুগন্ধী মাটি, কালমেঘ আর অনন্তমূলের সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ—"বেহায়ার মতো চাষ করে, বিদ্রোহ করে, আর মারও খায়। ঋতুচক্রের মত এই ত্রিদশার আবর্তনে তাদের দিনসন্ধ্যের সমস্ত মুহূর্তগুলি ঘুরপাক খায়।"[১৩] জল বহনের জন্য ব্যবহৃত তৈজস-মোষের চামড়ার থলি। মুরগি বলি, হাঁড়িয়া পান, নিত্য সন্ধ্যায় ঢোলক-মাদল বাজিয়ে আনন্দ উৎসব আর অপরিমেয় জংলী সহিষ্ণুতা এদের জীবন-ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে গল্পে বিধৃত করে রেখেছে। এ গল্পে শুধু কুর্মী জাতির জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নয়, সামন্ততন্ত্রের জীবন-ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয় আছে—সাবেক কালের কেল্লা, মরচে পড়া কামান, দপ্তরে দপ্তরে পাগড়ি আর তরবারির ঘটা, দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মতো তামা আর লোহার ঢাল, শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের রাজআস্তাবল, সচিব-সচিবোত্তম-ন্যায়াধীশ-ফৌজদার, দেব তুল্য এই অশ্বগুলির জন্য প্রজাদের কাছ থেকে ভুট্টা-যব-জনার কেড়ে নেওয়া, অপূর্ব-অদ্ভুত শাসনের ঝাঁজ, আর বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো—সামন্ততন্ত্র ও সামন্ত-প্রভুর ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। এই সংস্কৃতির বাহক মহারাজার এককুড়ির উপর উপাধি, তিনি ফিউডলী দেমাকে অন্ধ, ইজ্জত কমপ্লেক্সে জর্জর, অপরাধীকে ন্যাংটো করে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া, কেল্লার সামনে লাঠি সহযোগে প্রতি রবিবার চিড়ে গুড় বিতরণ, সংক্রান্তির দিনে আল্পনা আঁকা হাতির পিঠে চড়ে প্রজার প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ, মহারাজার জন্মদিনে রামলীলা গান, এগারো বিঘা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগান বাড়ানো, নহবতের জন্য মাইনে করা ইটালিয়ান ব্যান্ডমাস্টার, নতুন দুটো পোলো গ্রাউণ্ড, স্কুল প্রতিষ্ঠায় তীব্র আপত্তি সামন্ততান্ত্রিক জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে।

মহাকাব্য জাতীয় জীবন, ইতিহাস, সংস্কৃতিকে ব্যক্ত করতে এক বা একাধিক সমুন্নত ও বীরোচিত চরিত্রের কার্যকলাপকে অবলম্বন করে। এগল্পে দুই নায়ক—দুলাল মাহাতো আর মুখার্জী। 'আমাদের মুখার্জী আদর্শবাদী'। দুইজনেই শান্তবুদ্ধি, সৎ-সাহসী, দু-জনেই ট্র্যাজিক। দু-জনেই কল্যাণকৃত। দুলাল মাহাতো রাজ্যের কুর্মীদের অস্তিত্ব রক্ষায় সমগ্র কুর্মীদের একত্রিত করে মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বজাতীর কল্যাণে ও উন্নয়নে সচেষ্ট মাহাতো যেমন কুর্মীদের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জনের প্রতিজ্ঞা করেছে, তেমনি কুর্মীরাও মাহাতোর জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দুলাল মাহাতো কুর্মীদের সংঘবদ্ধ করেছে আর মুখার্জী রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন, শোষক-শোষিতের সমন্বয় সাধন, কৃষি ও শিল্পের সহাবস্থানে সর্বদা সক্রিয় থেকেছে। এ গল্পে দুইজনেই ধীর-উদাত্ত মহাকাব্যিক নায়কের মর্যাদা দাবি করে।

সুবোধ ঘোষ 'ফসিল' গল্পে অত্যন্ত জটিল ও প্রসারিত বিষয়কে মানব সভ্যতার বিস্তৃত কালের পটভূমিতে বিন্যস্ত করেছেন। এমন জটিল ও গুরুগম্ভীর প্রসারিত বিষয় তীব্রগতি সম্পন্ন, বিদ্রূপাত্মক ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা ও উপস্থাপন কৌশলের গুণে প্রতীতি নির্ভর ছোটোগল্প গোত্রান্বিত 'ফসিল' মহাকাব্যিক বিস্তারলাভ করেছে। এই গল্প থেকে যেমন ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের পাঠ নেওয়া সম্ভব তেমন মহাকাব্যিক পাঠ নেওয়াও সম্ভব।

উৎসের সন্ধানে

১. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : 'ফসিল : সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রকাশভবন, কলকাতা, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭
২. তদেব : পৃ. ২৭
৩. তদেব : পৃ. ৩১
৪. তদেব : পৃ. ৩০
৫. তদেব : পৃ. ৩২
৬. তদেব : পৃ. ৩২
৭. তদেব : পৃ. ৩২
৮. তদেব : পৃ. ৩১
৯. তদেব : পৃ. ২৯
১০. তদেব : পৃ. ৩০
১১. তদেব : পৃ. ৩০
১২. তদেব : পৃ. ৩০
১৩. তদেব : পৃ. ৩৩
১৪. তদেব : পৃ. ৩২
১৫. তদেব : পৃ. ৩০-৩১
১৬. তদেব : পৃ. ৩২
১৭. তদেব : পৃ. ৩৬
১৮. তদেব : পৃ. ৩৫
১৯. তদেব : পৃ. ৩৭
২০. তদেব : পৃ. ৩০
২১. ইন্দ্রাণি চক্রবর্তী : 'বাংলা ছোট গল্প রীতি-প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ', রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২০৭
২২. উৎস-১, পৃ. ৩২
২৩. তদেব : পৃ. ২৮

তথ্যের সন্ধানে

১. উত্তম পুরকাইত : উজাগর-সুবোধ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা, সম্পা. ঘরোয়া আড্ডা, উলুবেড়িয়া, ১৪১৫
২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত : 'গল্পচর্চা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮
৩. বীরেন্দ্র দত্ত : 'বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ', এস পি পাবলিশিং, বারুইপুর, ১৯৮৯
৪. ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী : 'বাংলা ছোটগল্প রীতি-প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ', রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৪
৫. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : 'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রকাশভবন, কলকাতা, ১৪২১ বঙ্গাব্দ